শতবর্ষে শিল্পী সুনীলকুমার পাল

প্রশান্ত দাঁ

ভারতীয় সংস্কৃতিতে এক সুনিবিড় ঐশ্বর্যের প্রতীক তার রূপচেতনা। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সভ্যতায় উদ্ভব হয়েছে গগনচুম্বী কারুকার্যময় স্থাপত্য, অনিন্দ্যসুন্দর চিত্রকলা এবং ভাবগম্ভীর বলিষ্ঠ ভাস্কর্যের। এইসব সৃষ্টিতে স্রষ্টারা এক অনির্বচনীয় রূপবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন, যা কাল থেকে কালান্তরে প্রবাহিত হয়ে ঐতিহ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আধুনিক শিল্পাঙ্গনে এই ঐতিহ্যের অন্যতম উজ্জ্বল উত্তরাধিকারী হলেন শিল্পী সুনীলকুমার পাল।

সুনীলকুমার পালের জন্ম ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে। শৈশবে মূর্তি গড়া, ছবি আঁকা, কাঠ খোদাই প্রভৃতি সবই করেছেন অন্তরের সহজাত তাগিদ থেকে। এসব কাজে সস্নেহ প্রশ্রয় ছিল মা ও দাদামশাইয়ের। ফলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে (১৯৩৫) কোনও অসুবিধে হয়নি। এখানে পেয়েছিলেন মুকুল দে, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, বসন্ত গাঙ্গুলি, প্রহ্লাদ কর্মকার, বলাই দাস প্রমুখ শিক্ষকদের। অধ্যক্ষ মুকুল দে-র স্নেহধন্য এই ছাত্রটি ছাত্রাবস্থাতেই কালিম্পং যাওয়ার পথে তিস্তা নদীর ওপর করোনেশন ব্রিজ স্থাপনার জন্য ব্রিটিশ উনিকর্ণের দশ ফুট লম্বা প্লাস্টার মূর্তি এবং দুটো বড় আয়তনের বাঘ নির্মাণ করেছিলেন। প্লাস্টার থেকে ওইসব মূর্তি ব্রোঞ্জে ঢালাই করেছিলেন 'নর্টন কোম্পানী'। এইসময় করা তাঁর আর একটি প্রশংসাধন্য ভাস্কর্য 'ইউরেকা'। আর্ট স্কুলের শেষ পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন ১৯৪০ সালে।

১৯৪২ সালে নেপাল সরকারের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ আসে সেখানকার প্রধানমন্ত্রী যুধা সামসের জঙ্গ বাহাদুর রাণার প্রতিমূর্তি গড়ার জন্য। এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় সুনীলের টিচারশিপ পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ নিয়ে আক্ষেপ করাতে অধ্যক্ষ মুকুল দে তাঁর এই প্রিয় ছাত্রটিকে বলেছিলেন, ''তোর পরীক্ষা ওইখানে গিয়ে দিগে যা।'' বলাই বাহুল্য, নেপাল গিয়ে এই তরুণ শিল্পী টিচারশিপের চেয়ে অনেক বড় পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সামসেরের মূর্তি দেখে সন্তুষ্ট হয়ে নেপাল সরকার তাঁর ওপর নতুন দায়িত্ব দেন নেপালের রাজা ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহদেব রাণার মূর্তি রচনার। সে-পরীক্ষাতেও শিল্পী জয়ী হয়েছিলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। এই কাজের সুবাদেই

বাঁদিক থেকে : শিল্পী বিমান দাস, সুনীল কুমার পাল ও লেখক

তিনি ভারতীয় ভাস্কর্যের নেপালি ধারাটিকে বুঝে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

সুনীল পাল ছিলেন আমার পিতা প্রয়াত মধুসূদন দাঁ-র বাল্যবন্ধু। আমাদের শোভাবাজার বেনিয়াটোলা স্ট্রিটের বাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা ছিল। সে-বাড়িতে সেইসময় শিল্পসংস্কৃতিমনস্ক কয়েকজন তরুণ একত্রিত হয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বীরু চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল পাল প্রমুখ। এঁরা 'প্রগতি' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা বের করতেন। নেপালে যাওয়ার প্রাক্কালে এই বন্ধুরাই আমাদের বাড়িতে শিল্পীকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। এ-প্রসঙ্গে সুনীল পাল লিখেছেন, ''শিল্পের পথ চলতে চলতে জীবন কাটল। ভাগ্যগুণে সমাদর, সংবর্ধনা সব পেয়েছি, দেশের সর্বোচ্চ শিল্প-পুরস্কারও পেয়েছি, বিধাতা আমায় অনেক দিয়েছে। কিন্তু আমাকে জীবনের প্রথম সংবর্ধনা দিয়েছে আমার এই বাল্যবন্ধুরা। বিয়াল্লিশ সালে নেপাল গেলাম মূর্তি গড়তে নেপাল সরকারের আহ্বানে, এই উপলক্ষ্যে আমারই এই বন্ধুরা মিলে দশ-বারো জনের একটি সভা ডেকে মধু দাঁর দোতলার বৈঠকখানায় আমায় সংবর্ধনা জানিয়েছিল। তারা সেদিন কী ভেবে জয়যাত্রায় পাঠিয়েছিল জানি না। কিন্তু সেই সভায় যথারীতি মানপত্র দিয়েছিল আবার উপঢৌকনও দিয়েছিল।''

কলকাতায় ফিরে এসে সুনীলবাবু কবি কালিদাসের 'মেঘদূত' অবলম্বনে কয়েকটি বড় মাপের রিলিফ ভাস্কর্য রচনা করেছিলেন। এরই মধ্যে একটি 'অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস'-এর বার্ষিক প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক লাভ করে (১৯৪৬)। স্নিগ্ধতা, লাবণ্য, ছন্দ ও গতিময়তায় আসীন এই ভাস্কর্যটি শিল্পরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যকে প্রাণভরে ভালবাসলেও সুনীল পালের শিল্পিমনে কোনও অন্ধ সংস্কার ছিল না। উপলব্ধিকে রসোত্তীর্ণ করার অভিপ্রায়ে তিনি বেছে নিয়েছেন নানা কৌশল। যেমন মানবশরীর গঠনে অনেক সময়ে তিনি পাশ্চাত্য আঙ্গিকের সাহায্য নিতে কার্পণ্য করেননি। একসময় রোদ্যাঁ তাঁর অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর 'থিংকার' মূর্তি অবলম্বনে সুনীল ভাস্কর্য রচনা করেছিলেন (১৯৪০)। 'ইউরেকা'র কথা আগেই বলেছি। এতে তিন কর্মঠ শ্রমিকের কম্পোজিশনে কিছু একটা খুঁজে পাওয়ার প্রাণখোলা আনন্দের অভিব্যক্তি কী অপরূপই না হয়ে উঠেছে! এ-প্রসঙ্গে কাঠমান্ডুতে করা মূর্তি দুটির কথাও মনে পড়ে। পরবর্তী কালে শিল্পী যেসব মূর্তি রচনা করেছেন তার মধ্যে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নেতাজী, লেডি রাণু মুখার্জি, বাঘাযতীন, ডা. বিধানচন্দ্র রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গান্ধিজী, সজনীকান্ত দাস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এ-প্রসঙ্গে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখাবয়বটির কথা না বললেই নয়।

দক্ষিণের বারান্দায় তাঁকে স্টাডি করে গড়া। শেষদিন অবনীন্দ্রনাথ নিজের মৃন্ময় মূর্তি দেখে নিয়ে তরুণ ভাস্করকে বলেছিলেন, ''আর কত করবে?'' শিল্পী তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, ''হয়ে এসেছে, এবার ফিনিশ করব।'' উত্তরে শিল্পগুরু বলেছিলেন, ''না না ফিনিশ কোরো না। ফিনিশ করলে তো ফিনিশ হয়েই গেল। এই বেশ।'' পরে বললেন, ''আমার আসল মুখ কোনটা! জন্মালাম একরকম। বড় হলুম একরকম। যদি আরও বাঁচি তো আরও একরকম। এইখানেই শেষ করো। আরও বাঁচলে আরও হত। কোথায় থামতে হবে এ শুধু বড় আর্টিস্টরাই জানে।'' ১৯৫০ সালে নিউদিল্লির অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস সোসাইটি আয়োজিত সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে এই নিদর্শনটি সেরা ভাস্কর্যরূপে পুরস্কৃত হয়।

সুনীলকুমার পাল কৃত একটি ভাস্কর্য (উপরে) ও একটি চিত্র

রিলিফ ভাস্কর্য নির্মাণেও সুনীল পালের পারদর্শিতা ছাত্রাবস্থা থেকেই। 'মেঘদূত'-এর কথা আগেই বলেছি। ১৯৫০ সালে বাস্তবানুগ পদ্ধতিতে গড়া ব্যারাকপুর গান্ধিঘাটের রিলিফ ভাস্কর্য চোখ মেলে দেখবার মতো। এগুলি গান্ধিজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূর্তিমালা। একাজে তিনি সাহায্য নিয়েছেন জাভা, বালির ভাস্কর্যে ভগবান তথাগতের জীবন একের পর এক উপস্থাপনার কৌশল থেকে। কলকাতার 'অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস'-এর প্রবেশদ্বারের মাথায় 'চিত্রকর ও ভাস্কর্য', পোড়ামাটির 'প্রসেশন', 'নিত্যানন্দ জগাই মাধাই', মিনার ছায়াছবির হলে অপ্সরাদল এবং পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকটি রিলিফ ভাস্কর্য শিল্পীর দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে। বহুক্ষেত্রে রিলিফে 'রাউন্ডনেস' সৃষ্টি করে এমন একটি গতির সঞ্চার করা হয়েছে যা দেখামাত্রই মনে হয় গতিশীল। স্থিতিশীলতার মধ্যে গতিশীলতা।

ভাস্কর্য তৈরির পাশাপাশি সুনীল পাল প্রতিমাও গড়েছেন। কলকাতার আর্ট স্কুলে ও 'রূপযানী' সঙ্ঘে সরস্বতী, দেওঘর বিদ্যাপীঠে কালীপ্রতিমা, কুমোরটুলি ও শোভাবাজারের হাটখোলা ও বিডন পার্কে কয়েকবছর যাবৎ দুর্গাপ্রতিমা গড়েছেন। প্রথম দুর্গাপ্রতিমা গড়েন ১৯৪৫ সালে ভবানীপুরের কাঁসারিটোলায়। একচালা দুর্গাপ্রতিমার ছাঁচ-ভাঙা সেই ক্লাসিক ঢঙের মূর্তি শহরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কাগজে কাগজে প্রশংসা বেরিয়েছিল। প্রতিমা সাতদিন রাখা হয়েছিল যাতে দলে দলে মানুষ সেই প্রতিমা দর্শন করতে পারেন। কিন্তু শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ সেই প্রতিমার ছবি দেখে বলেছিলেন, ''কুমোরেরা যা করে তাই ঠিক। মেলা পার্বণে ক্লাসিক মূর্তি আড়ষ্ট বলে মনে হয়। পারমানেন্ট ভ্যালু এক্ষেত্রে আর্টকে ভারাক্রান্ত করে তোলে।'' এরপর সুনীল পাল প্রতিমা গঠনে ক্লাসিকের ছায়া আর মাড়াননি। শিল্পীর কথায় : ''কুমারটুলির পুরনো ঢং থেকে অনেক উপাদান গ্রহণ করেছি, বাঁকুড়া, বীরভূম, মানভূম, ত্রিপুরা প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্পের বা ফোক-আর্টের অফুরন্ত দৃষ্টান্ত থেকে এবং নেপালে তিব্বতী মন্দিরে যে-রংকরা মূর্তির

বিদ্যাপীঠের প্রবেশদ্বার

রেওয়াজ দেখেছি তা থেকে, এমনকী মিশরীয় ছবির সরলতা থেকেও আমি যে-শিক্ষা পেয়েছি তা আমার প্রতিমাশিল্পে আরোপ করে আমি নতুন ভাব দিতে সচেষ্ট ছিলাম।" বিগত কয়েক দশক ধরে 'আর্টের ঠাকুর', 'থিমের ঠাকুর' প্রভৃতি ভাবধারার প্রতিমা খুবই জনপ্রিয় হয়েছে এবং তা নিয়ে রীতিমতো মাতামাতি ও প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। কিন্তু আমরা ভুলে যাই চিরাচরিত, পরম্পরাগত প্রতিমার ছাঁচ ভেঙে নতুন দেবীরূপের অবতারণা এখানে করেছিলেন সুনীল পাল।

চিত্র, ভাস্কর্য, প্রতিমা ছাড়াও শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ যাতায়াত ছিল তাঁর। সভাসমিতি, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি উপলক্ষ্যে কত মানুষের আমন্ত্রণপত্র অলংকৃত করে দিয়েছেন কে তার হিসেব রেখেছে! বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের মতো আরও কয়েকটি সঙ্ঘের আমন্ত্রণপত্র চিত্রণে, ভাবে রসে অপূর্ব। সেখানেও নিজস্বতার সুস্পষ্ট ছাপ আছে। স্থাপত্য নিয়েও তাঁর চিন্তাভাবনার শেষ ছিল না। Architecture is the mother of an art—এই শাশ্বত কথাটিকে মনে রেখে শিল্পী পরম শ্রদ্ধায় তাকে কাজে লাগিয়েছেন। স্থাপত্যের সঙ্গে ভাস্কর্যকে একাত্ম করতে চেয়েছেন এমনভাবে যে দেখলে ভিন্ন ভিন্ন মনে হবে না। শিল্পিজীবনের প্রভাত থেকেই এই চিন্তার উন্মেষ। হরিপ্রিয় পালের চলচ্চিত্রগৃহগুলিতে কিংবা আলমবাজারে ঠাকুরবাড়ির দেওয়ালের গায়ে ছড়িয়ে আছে এই শিল্পচিন্তার ফসল। কিন্তু এই ধরনের কাজের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ।

বিদ্যাপীঠের মূল প্রবেশদ্বার থেকে মন্দির, জিমনাসিয়াম, শিবানন্দ সদন, সারদা মন্দির, বিবেক মন্দির, দেবযান, স্বদেশ বেদি প্রভৃতির নির্মিতিতে লক্ষ করা যায় নতুন নন্দনমাত্রা। গঠনভঙ্গি নবীন ভাবসম্পদে প্রাণময়। শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরটির স্থাপত্যকৌশল অত্যন্ত সাদামাটা। মন্দিরের অন্দর বাইরে নকশা, কারুকার্য বা কোনও বাহুল্য নেই। এমনটি করা হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ জীবনদর্শনের কথা ভেবে। তাঁর জীবন ছিল আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ। এ-মন্দির যেন তারই প্রতীক। মন্দিরের মাথায় সিমেন্টের তৈরি উঁচু পঞ্চবটের সমাহার। জানালাগুলি অনেক উঁচুতে

বিদ্যাপীঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির

জিমনাসিয়াম বাড়ির দেওয়ালে মহাবীর

দেওয়ালে রিলিফে উৎকীর্ণ মহাবীর হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত বয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যব্যঞ্জনায় শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বিদ্যাপীঠের মূল প্রবেশদ্বারের স্থাপত্য-সৌন্দর্য দেখবার মতো। পরিষদ ভবন, নিবেদিতা কলামন্দির প্রভৃতি সবকিছুর মধ্যেই নান্দনিক স্পর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবাদর্শকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে পবিত্র সুন্দর পরিবেশ রচনা করে। এবং অনুভূমিক, দিনের আলো স্বাভাবিকভাবে ঢোকে না। ফলে মন্দিরের অভ্যন্তরে আলো-আঁধারির পরিবেশ। ধ্যান ও উপাসনার কথা মাথায় রেখে এমন আবহ সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যদিকে সারদা মন্দিরের মাথায় যুগ্ম মকরের মুখ। তাতে সূর্যমুখী ফুলের কুঁড়ি। দেবযান বাড়ির সম্মুখ ভাগ রথের আকৃতির। রথ গতির প্রতীক। দেবযান হল অফিসবাড়ি, বিদ্যাপীঠের সমস্ত কার্যপ্রবাহের কেন্দ্রস্থল, তাই রথের প্রতীকে গতিশীলতার আভাস দেওয়া হয়েছে। স্থাপত্যের সঙ্গে শিল্পকলার সংযোজন গভীর অর্থপূর্ণ ও ভাবব্যঞ্জক। গৃহের কার্যবিধি, ব্যবহারের সঙ্গে সমতা রেখে রূপায়ণ। যেমন সারদা মন্দিরের গায়ে দেবী সরস্বতী, সূর্য, পদ্মফুল, হংস, প্রদীপ ইত্যাদির রিলিফ জ্ঞান, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কর্মযোগের ইঙ্গিত বহন করে। আবার জিমনাসিয়াম বাড়ির ভাস্কর্য সমন্বিত স্থাপত্যের গায়ে উৎকীর্ণ হয়েছে তাঁদের বাণী। ছবি, মূর্তির অসাধারণ রিলিফ কাজ দিয়ে সাজানোর ফলে গোটা পরিমণ্ডল ভাবে রসে সৌন্দর্যে অনির্বচনীয় হয়ে উঠেছে। কয়েক একর বিরাট চত্বরে এইসব শিল্পকীর্তি দেখতে দেখতে মনে হয় গোটা বিদ্যাপীঠটাই শিল্পী সুনীল পালের শিল্পকলার প্রদর্শনী।

সারদা মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ সরস্বতী

বিদ্যাপীঠের স্থাপত্যকলার কেউ প্রশংসা করলে সুনীল পাল সবিনয়ে বলতেন, ‘‘আমি নয়, আসল শিল্পী স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ মহারাজ।’’ তিনিই সুনীল পালকে দিয়েছিলেন এই গুরুদায়িত্ব। আর দিয়েছিলেন মনের মতো করে শিল্পকলা দিয়ে সাজাবার অবাধ স্বাধীনতা। বিদ্যাপীঠ সম্পর্কে তিনি পরবর্তী কালে লিখেছেন, ‘‘সোজা গেট থেকে দৃষ্টি চলে যাচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে—বিদ্যাপীঠের সমস্ত কর্মযজ্ঞের প্রেরণার উৎস।

এই প্রবেশদ্বারের নিচের দিকে দুইপাশে সিমেন্টের সঙ্গে রং মিশিয়ে আলপনা—সুনীল পালের নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির সুন্দর অভিব্যক্তি। বিদ্যাপীঠের প্রবেশদ্বার থেকে পৌরুষত্বের বিরাটত্বের দিকে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের সামনে উৎকীর্ণ হয়েছে : 'সেই জগতের প্রসবিতা দেবতার বরেণ্য যে-জ্যোতি আমাদের বুদ্ধিকে পরিচালিত করছে তাকে ধ্যান করি', এবং সারদা মন্দিরে শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে স্বামীজীর বাণী। এইভাবে বাণীতে ও রূপে আঙ্গিকে ও রূপকল্পনাতে মিলিয়ে মিশিয়ে তৈরি হয়েছে বিদ্যাপীঠ।"

সারদা মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতমাতা'

দীর্ঘ জীবনে শিল্পসাধনার নিরিখে যেভাবে সমাজ শিল্পকে দেখেছেন তা সুনীল পাল লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রধানত লেখা শুরু করেন জীবনের প্রত্যন্তবেলায়। তখন শিল্পকাজ অনেক কমে এসেছিল। তাছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর লেখা কিছু পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। আমিও তাঁকে নিয়ে এখানে-ওখানে বিভিন্ন সময়ে লিখেছি এবং সাক্ষাৎকার নিয়েছি। অপ্রকাশিত কিছু লেখাও ছিল। এইসব আমি দুই মলাটে একত্রিত করে সংকলন করি। আমার সম্পাদিত এই পুস্তকটির নাম 'কিছু স্মৃতিকথা কিছু শিল্পভাবনা'। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন রাজ্য চারুকলা পর্ষদ বইটি প্রকাশ করেন ১৯৯৮ সালে। ২০০৫ সালে এটি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি কর্তৃক পুরস্কৃত হয় সেরা সাহিত্যের জন্য। শিল্পকলার মতো তাঁর রচনারও একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। শিল্পের তাত্ত্বিক ও নান্দনিক দিকটি নিয়ে নিজস্ব অনুভূতির আলোকে সহজ সরল ভাষায় লেখা।

বহু গুণের অধিকারী সুনীল পাল কর্মসূত্রে কলকাতা গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটস্-এর মডেলিং এবং স্কাল্পচার বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন (১৯৫৭-১৯৮০)। একসময়ে কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। জীবনভর অনেক সম্মান ও সংবর্ধনা পেয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'অবনীন্দ্রনাথ পুরস্কার' (১৯৮৭), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অ্যাকাডেমি পুরস্কার' (১৯৮৮-৮৯), অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড (২০০৩), ইনফ্যাক-এর সম্মাননা। সর্বজনশ্রদ্ধেয়, সদা হাস্যময়, পরোপকারী, সহজ-সরল মানুষটির জীবনযাত্রাও ছিল নিতান্তই সাদামাটা। কিছুকাল রোগভোগের পর ২০১২ সালের ২ আগস্ট কৃতী শিল্পী তাঁর পাতিপুকুরের বাড়িতে প্রয়াত হন বিরানব্বই বছর বয়সে। পিতৃপরিচয়ের সূত্রে তিনি হয়ে গিয়েছিলেন আমার কাকাবাবু। তাঁর প্রয়াণে আমি হারাই পিতৃতুল্য একজন কাছের মানুষকে। জন্মশতবর্ষে তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।